

ভূমিকা: চ্যাপ্টার শূন্য ।

মোটামুটি ভাসিটি শুরু করার সময় থেকে প্রত্যেক সেমিস্টারের শেষে একটা লেখা লিখে রাখতাম ওই সেমিস্টারের মেমরি নিয়ে, ডায়েরির মতো অনেকটা । প্রথম দিকে বেশ গোছানো আর ভাল মতই চলছিল । কিন্তু আস্তে আস্তে আর ওভাবে গুছিয়ে লিখে রাখা সম্ভব হয় নি । অনেকটা খাপছাড়া আর রাফ লেখার মতো হয়ে গিয়েছিল একটা সময়ে , কিন্তু তাও চলছিল কোনরকম আর কি । তো ৪-২ এর শেষে এসে ম্যাগাজিন এর জন্য লেখা দরকার । মনে হল, এর থেকে বেটার মনে হয় আমি পারব না । তাই ওই সব টুকরো টুকরো লেখা নিয়ে এই কালেকশন । ভাল লেখা আমি কোন দিনই লিখতে পারতাম না, আজ ও পারি না । আর ঐ ছোট ছোট রাফ গুলোর ও অনেক বিচ্ছিরি অবস্থা ছিল । ওগুলোকে মোড়ীফাই করতে পেরে আমার নিজের ই আসলে একটু ।

১৪/১০/২০১৮

রাত ১২.৩৬ ।

১-১: গল্প শুরু যেখানে ।

আমার ভাসিটি লাইফের শুরু ৫ জানুয়ারি, ২০১৫ (সম্ভবত, ডেট মনে রাখতে পারি না) । সেদিন ডেস্টে গুলোর একটা ইন্টারভিউ ছিল । *কচি মন, যা দেখি সবই নতুন লাগে* তখন এরকম অবস্থা । দেখে তো পুরোপরি ফীলে চলে গিয়েছিলাম, *ওয়াও কোথায় আসছি* । সেদিনের খুঁটিনাটি গুলো কেন জানি আমার এখনো খুব ভাল মতো মনে পড়ে, মানুষের হার্ডডিস্ক অনেক অদ্ভুত । কীভাবে জানি যেগুলো দরকার শুধুমাত্র সেগুলোকেই শুধু সেভ করে রাখে আর বাকিগুলোকে ফেলে দেয় । যাই হোক, সেদিন সকালের কাহিনীতে ফিরে আসি । আমি সবসময়ই একটু আগে যাই ভাসিটিতে । সেদিন ও গিয়েছি, (এতো আগে যে গেট ও খুলে নাই ...) , বাইরে দাঁড়িয়ে । অনেকক্ষণ পরে দেখি একটা লোক আসল, নীচের কেঁচিগেট খুলল । তো যেহেতু গেট খোলা উপরে চলে গিয়েছি ।

লোকটার বিবরণ দেয়া যায় একটু । লম্বা বেশ, শুকনাও না আবার যে খুব মোটা তাও না, বয়স বেশি না । দেখি অফিস স্টাফ মনে হয় না, আবার যে কোন টিচার তাও মনে হয় না । যাই হোক ফিটফাটনেস দেখে আমি আর আমার আকাঙ্ক্ষা ধরেই নিলাম, সম্ভবত উনি টিচারই হবেন । এরপরে আমি এই দুইতলার কমন স্পেসের দিকে হাঁটছি আর উনি হাঁটছেন ভেতরের দিকে । আমি মোটামুটি বুঝছিলাম না যে কী করা উচিত বা কখন ভর্তি শুরু, মোটামুটি আইডিয়া নেই যে কি করব । একটু পরে উনি আসলেন, জিজ্ঞেস করলেন,

- "ফার্স্ট ইয়ার ? "
- "জী ।"
- "৮.৩০ টায় শুরু হবে চাইলে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে পারো । "
- "জী আচ্ছা । "

তো এভাবেই জামি স্যারের সাথে আমার দেখা, পরিচয় অবশ্য জেনেছিলাম সাত দিন পরে আমাদের অরিয়েন্টেশনের দিন । অরিয়েন্টেশনের দিন একটা কথা স্যার আমাদের বলেছিলেন, "আমার সাথেই তোমাদের ইন্টারঅ্যাকশন সবচাইতে বেশি হবে ।"

আমাদের ব্যাচের ইন্টেরেস্টিং অনেক কিছুই জামি স্যারের সাথে রিলেটেড ।

ডেস্টে সবার আগে আমার পরিচয় হয় সাকিবের সাথে (সাকিব আনোয়ার টু বি স্পেসিফিক, অনেকগুলো সাকিব তো) । তখন কাওকে চিনি না, ফেসবুকে CSEDU 21st Batch নামে আমাদের একটা গ্রুপ ও খোলা ছিল (যেখান হাই আমি তোমার ক্লাসমেট, আমরা কি বন্ধু হতে পারি এরকম কমেন্টের আদান প্রদান হতো) যার ব্যাপারে ও আমি কিছু জানতাম না , তো তখন এনডিসি দেখলেই ভাই ভাই মনে হতো আর কি । যাই হোক, এই গ্রুপের ব্যাপারে খবর আমি সাকিবের কাছ থেকেই প্রথম পাই । আরো জানলাম সবাই নাকি মেলা দিন ধরে ফেসবুকে একটিভ, সবাই কাইন্ড অফ সবার ব্যাপারে জানে । এগুলা শুনে আমার আরো ছানাবড়া অবস্থা । এগুলা সবই পাঁচ তারিখের ঘটনা । এরপরে আস্তে আস্তে বেলা বাড়ছে আর একুশের সব জনগণ আস্তে আস্তে আসছে । একেক জনের কত অদ্ভুত রকম ঘটনা । দেখি এক ছেলে বিস্তের মতো সিএসইডিউ এর গুণকীর্তন করে যাচ্ছে, কন্টেন্ট রিলেটেড ইতিহাস গাথা বয়ান করে যাচ্ছে, আমার ফার্স্ট কোর্সে যেটা নক করেছিল, এই ছেলে এতো কিছু জানে কীভাবে, পরে ওর নাম জানলাম সোহান । এরপরে দেখি একটা ছেলে

সুপারম্যানের কালো গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অনেক মিশুক টাইপের, নাম জানলাম অমর । আরেকটা ঘটনা যেটা ইন্টেরেস্টিং, একটা ছেলে এসে একদম সেদিনই সবাইকে তুই তুই করে বলা শুরু করল আর আমাকে জানাল,

- আমি নিচে যাচ্ছি শুরু হলে একটা ফোন দিস । এই নে নাম্বার ।

আমি নাম্বার নিয়ে ও ফোন দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আর মজার ব্যাপার ওর নাম্বার আমি যতবারই সেভ করি প্রত্যেকবারই কোন না কোন কারনে হারিয়ে যায় । ছেলেটার নাম সাকলাইন । অথচ এর সাথে আমার এই চার বছরে ইন্টারঅ্যাকশন সবচেয়ে বেশি হয়েছে । এরপরে আগের ধূপ করে কিছু চেনাজানা মানুষকে পাওয়া গেল, শাহীন (কলেজ ফ্রেন্ড) আর ইমন (উদ্ভাস কোচিং ফ্রেন্ড) । আরেকটা ছেলের কথা না বললেই না, মুনতাসির ।

মুনতাসির ওয়াহেদ । ওর ব্যাপারে আমি আমার স্কুলের পরিচিত এক আন্টির কাছ থেকে ভর্তি হওয়ার আগেই শুনেছিলাম , *চট্টগ্রাম থেকে একটা ছেলে আসছে, আমার পরিচিত* । আমি ছোটবেলা অনেক জীবনী পড়তাম, ওই যে জ্ঞানীগুণী মনীষীদের কাহিনী। আমি বিশ্বাস করি, আমি আমার ভার্শিটি লাইফে এক এপিক লেজেন্ড এর সাথে ক্লাস করেছি । তার নাম এই মুনতাসির । এই ছেলে যে কি কি করেছে ফাস্ট দুই ইয়ার, ট্র্যাক রাখা কঠিন । পুরাই উরাধুরা অবস্থা । এই সকালে আন্দোলন করছে, বিকালে কন্টেস্ট করছে , রাতে গিয়ে ওয়েবসাইটের কাজ করছে আর ইয়া বড় বড় স্ট্যাটাস লিখছে । কি যে করত না আর ভার্শিটির কত ক্লাবের সাথে যে কানেকটেড ছিল ওইটা লিস্ট না করাটাই ভাল । আর বৃহস্পতিবার *বড্ড হয়রান লাগে আর পারি না* বলে বাসায় ফেরার জন্য কান্নাকাটি করত । আর যারা মুনতাসিরের স্ট্যাটাস দেখে নাই তারা আসলেও অনেক কিছু দেখে নাই । এই ছেলের ঠ্যালায় পড়ে এককালে প্রতদিন ফেসবুকে লেখা লাগত যাতে লেখার স্টাইল ডেভোলপ করে আর ওর ওয়েবসাইট স্বশিক্ষায় লিখতে পারি । আমি আমার লাইফের অনেক অনেক কিছু শিখেছি এই ছেলের কাছ থেকে আর প্রত্যেকটা মানুষ নিয়েই তো একেকটা ব্যাচ তৈরী হয়, আমি মনে করি মুনতাসির না থাকলে ২১ এর অনেক বড় একটা অংশ অপূর্ণ থাকত ।

শুরুর দিকের দিনগুলো অদ্ভুত রকম সুন্দর ছিল । প্রত্যেক দিন নতুন নতুন মানুষকে চেনা হচ্ছে । একেক দিন ভার্শিটির একেক জায়গা আবিষ্কার করা হচ্ছে । সবসময় সবজায়গায় লোকজন দল বেঁধে ঘুরতে যাচ্ছে , দল মানে পুরো ক্লাস, এ হিউজ টিম । আমার এখনো মনে পড়ে আমি খাওয়ার জায়গা চিনতাম না বলে শুধু হাকিম চম্বরে যেতাম । সাথে থাকত ইমন । আর আমাদের ব্যাচে মেয়ে মাত্র চার জন এই নিয়ে মানুষের শুরুর দিকে কত আফসোস ছিল (এখনো আছে মনে হয়.....) ।

আরেকটা মজার ব্যাপার ছিল, একদম শুরুর দিকে আমাদের সিনিয়র সবগুলো ব্যাচের পরীক্ষা আর তার পরে পরীক্ষা পরবর্তী ভ্যাকেশন চলছিল । এতে যেটা হলো, একটা ভাল সময় ডেপ্টে শুধুমাত্র আমরাই ছিলাম । পুরো টিটি টেবিল, ক্যারাম বোর্ড সব আমাদের দখলে । আমরা এতো বেশি খুশি হয়ে গেছিলাম যে, যেদিন ভাইয়া আপুরা এসেছিলেন সেদিন বুঝতেই পারি নাই যে সিনিয়র রা এসেছেন আর আমাদের একা দখলের দিন শেষ । যেদিন ২০ এর ভাইয়া আপুরা কথা বলতে এসেছিলেন, সেদিন আমাদের অবস্থা আসলেই দেখার মতো ছিল ।

কিন্তু কিছু জিনিস একটু খটকা লেগেছিল । আমরা যখন আসি তখন ফুল ডেপ্ট বিবর্ণ । ময়লা সব কিছু । চার মাস পর্যন্ত কোন ইভেন্ট পাই নি । সিনিয়র দেব সাথে ভয়ে কথা হয় না তাই চিনি ও না ঠিক মতোন । এই সব দেখে মুনতাসির তার নতুন ইশতেহার ঘোষণা করল ।

- আমরা নতুন নতুন ইভেন্ট দিয়ে ডেপ্ট ভরিয়ে দিব ।
- সব সিনিয়র ব্যাচের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন বাড়াব (ভয়কে জয় করে)
- ফেস্ট নামাব
- ডেপ্ট কালার করব
- আরো কতো বুদ্ধি যে বের করেছিল হিসেব নাই কোন ।

তো যেহেতু কোন রংই ঠিক মতো সবসময় রঙ্গিন থাকে না, একটা পর্যায়ে আস্তে আস্তে রং যখন শুকাতে থাকে তখন যেমন কিছুটা বিবর্ণ হতে থাকে ঠিক তেমন করেই আমাদের ফুল কালারফুল জীবন ১-১ শেষ হয়ে যায় । আর ১-২ শুরু হয় ।

১-২: একটা স্যাড চ্যাপ্টার

১-২ মনে হয় আমাদের ব্যাচের খুবই ভয়াবহ সময়গুলোর মধ্যে একটা। আমরা এমনভাবেও অনেক মারা খাওয়া একটা ব্যাচ। আমরা যে কী পরিমাণ মারা একেকটা সময় খেয়েছি তার হিসেব নেই আর এই লেগেসি সবসময়ই ছিল। ১-২ আসলে রাতারাতি অনেক গুলো মানুষকে বড় করে দিয়েছে। আর ১-২ এর ভাইভ ১-১ থেকে সম্পূর্ণ রকম আলাদা ছিল। ওটা যেমন রপিন এটা ঠিক তেমন বর্ণহীন। ডিপ্রেসন ভার্শিটি লাইফের একটা অনেক অনেক বড় সমস্যা। আর ১-২ আসলে এটার খুবই ভয়াবহ প্রভাবক ছিল। আমি ওই সময় কিছু মানুষকে অদ্ভুত রকম ভেঙ্গে যেতে দেখেছি। বলতে না পারা, বোঝাতে না পারা একটা অনেক অদ্ভুত প্যারা। মানসিক শক্তি বলে একটা ব্যাপার আছে যেটা ভার্শিটি লাইফে মারাত্মক দরকার, কিন্তু আমার মনে হয় অনেক ক্ষেত্রেই আসলে আমাদের চারপাশ ওই শক্তিকে আরো মজবুত করতে কোন বলের যোগান দেয় না বরং পুরো উল্টোটাই করে। যাই হোক একুশের অনেক অনেক স্যাড চ্যাপ্টার হলো ১-২।

ভাল মূহূর্তগুলো বলি। ১-২ এর খুব ভাল সময় গুলো বললে সম্ভবত নবীন বরণের সময়টা আসবে। ওই সময়টা আমার আসলেই বেশ পছন্দের। আর সত্যি বলতে এসময়ই আমি ডিপার্টমেন্ট এর সিনিয়র বেশির ভাগ মানুষকে চিনেছিলাম। স্পেশালি ফাহিম ভাই আর মাহির ভাই। আমি সম্ভবত উনাদের মতো এতো জোস আর অল স্কয়ার টাইপের মানুষ আগে দেখি নি, অসম্ভব ব্যালেন্সড রকমের দুইজন মানুষ।

আর আমাদের ব্যাচের সামিকে। এই ছেলে নবীনবরণের আগ পর্যন্ত পুরোপুরি ঘাপটি মেরে বসে ছিল আর এ যে কি একটা জিনিস...। ব্যাপারটা এরকম দাঁড়িয়েগিয়েছিল একটা পর্যায়ে, নবীনবরণে পার্ফরমেন্স লাগবে।

- গান গেতে পারো কেও ?
- সামি।
- নাচ ঠিক করা লাগবে। স্টেপ ঠিক করে দিতে হবে।
- সামি।
- আচ্ছা হামদে নাত পড়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।
- সামি।

অনেক ভারসেটাইল কোয়ালিটির কন্ট্রিনেশনের একজন মানুষ, আর ভাল মানুষ। আর ঐ সময় প্লাবন ছেলেটা যে কি পরিমাণ খেটে কোরিয়োগ্রাফি করেছিল, ওকে ধন্যবাদ দিলেও কম হয়ে যায়। আর নবীনবরণের দিনটা অসম্ভব রকম সুন্দর ছিল। আমার ভার্শিটি লাইফের খুব পছন্দের দিনগুলোর মধ্যে একটা।

আর আমি ঐ সময়ে ধূপ করে সি আর হয়ে গিয়েছিলাম আর এটা ২-২ পর্যন্ত হোল্ড ছিল। আমার ব্যাপারটা অনেকটা ভার প্রাপ্ত সি আর এর মতো ছিল। সি আর এর জীবন আসলেই অনেক কঠিন, এরা সবার কাছ থেকেই গালি খায়। ভাল করলেও খায়, কিছু না করলেও খায়, টিচাররাও বকেন, ক্লাসমেটরাও ঝাড় দেয়। এদের জীবনে গালি খাওয়া এই ব্যাপারটা সবসময় কনসিস্টেন্ট। তবে এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাচের নবনী চার বছর ধরে এই বলীর পাঠা (পাঠা ?) হবার দায়িত্ব নির্ভার সাথে পালন করে যাচ্ছে। ওর কিছু ফিচার বলা উচিত। সবার আগে আসবে ওর টোন। ও যদি ডেপ্টে আসে তাহলে সেটা তিনতলা থেকেও টের পাওয়া যায়। এতো জোরালো গলা ভাই রে ভাই। আর একটা জিনিস বলব, হিসেবী। ও যে কি পরিমাণ "রিয়েল লাইফ ক্যালকুলেটিভ", কোথায় কীভাবে টাকা বাঁচানো যাবে ও মুখে মুখে যে কি

পরিমাণ ফাস্ট হিসেব করে ফেলতে পারে এটা ওকে কেও না চিনে থাকলে বোঝা অসম্ভব । আর এই মানুষটা আমার অনেক পছন্দের ।

এবার আসি আমাদের প্রজেক্টের গল্পে । সিএসইডিউ তে ১-২ তে একটা প্রজেক্ট করা লাগে, সি ল্যাংগুয়েজ শেখার পরপরই এই প্রজেক্টটা দেয়া হয় তো , টেকনিকালি আমাদের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট জীবনের এটা বেশিরভাগ মানুষেরই প্রথম প্রজেক্ট হয়ে থাকে । তাই এটা সবসময়ই বেশ স্পেশাল । টিম হলো, আমার পার্টনার হলো ঋদ্ধ । ও হচ্ছে আমার দেখা, সবচাইতে ন্যাচারালি টেলেন্টেড মানুষ । ওর ইনটুইটিভলি যে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস চলে আসে, এগুলো আমার আসলে ... । আচ্ছা অনেক জল্পনা কল্পনার পরে ঠিক হলো আমরা একটা গেম বানাব, রাস্তা পার হওয়া রিলেটেড । চারদিক থেকে প্রচুর গাড়ি অনেক ফাস্ট যাওয়া আসা করবে । আর কাজ হবে, একজন লোককে রাস্তা পার করানো । আইডিয়া ছিল ঋদ্ধর । ও যে কি পরিমাণ খাটতে পারে । কোড লেখার সময় আমরা বুঝি নি ইমেজ কীভাবে ফিট করাতে পারি । তখন ঋদ্ধ ঠিক করল, ও গাড়ি আঁকার কোড লিখবে (!!!) । আমরা যখন রিপোর্ট জমা দেই তখন সেটার সাইজ ছিল একশ বিজ পেজ এর মতও যেখন ইমপ্লিমেন্টেশনই ছিল মনে হয় নববই পেজ আর শুধু গাড়ী আঁকার কোডই ছিল মনে হয় একহাজার প্লাস লাইন । এই প্রজেক্টের প্রায় পুরোটাই ওর করা ছিল । কি পরিমাণ যত্ন নিয়ে যে ও কাজ করতে পারে আর অসম্ভব ক্রিয়েটিভ একজন মানুষ । আমি আমার জীবনে অল্প স্বল্প যতগুলো প্রজেক্টই করেছি তার মধ্যে এটার আমার অনেক প্রিয়গুলোর মধ্যে একটা । তো এই প্রজেক্ট ডিফেন্স এর মাধ্যমেই আমাদের ১-২ শেষ ।

২-১: ফার্স্ট ফ্রেশার্স উইক ইন সিএসইডিই আর ১৯

২-১ এর শুরুই হয়েছিল আমাদের, মুনতাসিরের ইশতেহার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ।

ফ্রেশার্স উইক ।

২১ এর প্রথম প্রডাকশন । কিন্তু সবার আগে আমাদের অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে আরো দুইজন মানুষকে । ১৪ ব্যাচের ফরহাদ ভাই ওরফে আমাদের পিডি ভাই (পি = পুরান ডি = ঢাকা, ইংরেজিতে পি আর ডি অ্যালফাবেট) আর আমিন স্যারকে । স্যার আর ভাই আমাদের যেই পরিমাণ সাপোর্ট দিয়েছেন, ওটা লিখে বোঝানো সম্ভব না । আর সেই সাথে ছিল মুনতাসিরের অমানসিক পরিশ্রম । কি পরিমাণ যে খেটেছিল ছেলেটা । স্পনসরের সাথে কথা বলা, ফান্ড কালেকশন, ইভেন্ট প্ল্যানিং আর সকাল বিকাল চায়ের পর চা খাওয়া । অনেক অনেক গুলো মানুষের ডেডিকেশনের রেজাল্ট ছিল এই ফ্রেশার্স । আর কোন মানুষের নাম বলার চেষ্টা করব না, কারো নাম যদি ছুটে যায় তাহলে সেটা ভাল হবে না মোটেই । ফ্রেশার্স উইকের দিনগুলো অসম্ভব রকম কালারফুল ছিল, রিয়েল লাইফ কালারফুল । ওই কালারগুলোকে এই কিছু শব্দ দিয়ে তুলে আনাটা বেশ কঠিন । আমি এমন কোন আহামরি লিখি না যে আমার বর্ণনা শুনে লোকজন ওই সময়টাকে আবার টাইম লুপে চালাতে পারবে । একদম থার্ড পারসন হিসেবে কিছু জিনিস শুধু বলে যাই, যদি এইগুলোই আবার কিছু মানুষের আন্তরণ পড়া স্মৃতি গুলোকে যদি একটু জাগাতে পারে ।

আমার মনে পড়ে ওই অকটাগন সাজানোর কথা । প্রথমবারের মতো ডেপ্ট এর সাততলা থেকে কোন ডেকোরেশন । আমরা যেটা করেছিলাম কালারফুল ছোট ছোট ছাতা দিয়ে উপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম । পুরো জিনিসটা এতো বেশি লুকরেটিভ ছিল, স্পেশালি যখন আলো পড়ত তখন, স্পেশালি ওই কালারফুল রিফলেকশনগুলো । আমার দেখা বেস্ট ডেকোরেশন এখন পর্যন্ত ।

এই সময়ের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে স্মরণতিগুলো । প্রতিদিন একসাথে বসে প্ল্যান করা কে কোন দিকে যাবে, কোনদিন কীভাবে করা উচিত, কোন সময়ে কোন ইভেন্ট থাকলে ভালো । মাঝে মাঝে একসাথে হেঁটে যাওয়া আর জীবন নিয়ে করা প্ল্যানগুলো নিয়ে কথা বলা, নিজের চিন্তা ভাবনা গুলোকে তুলে ধরা, কার্জনে একসাথে চুপচাপ বসে নিঃশব্দতাকে উপভোগ করা, ফুলার রোডে রাতের বেলা হেঁটে যাওয়া, বিকালের শেষ সময়টাতে সায়েন্স লাইব্রেরির পিছনে একসাথে বসে চা খাওয়া আর দিনশেষে নিজের মানুষগুলোকে চেনা । দীপ্ত একটা কথা বলে, একটা মানুষকে নিজের সার্কেল চিনে বের করতে হয়, নিজে বিলং করে এমন একটা সার্কেল বার করে নিতে হয় । আমার মনে হয় ফ্রেশার্সের সবচাইতে বড় প্রাপ্তি

এটাই। তো আস্তে আস্তে এই কালারফুল সময়টাও শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ২১ এর মানুষগুলার এই রেশ এখনো যায় নি, চারটা বছর পরেও এতটুকু হারিয়ে যায় নি।

এ সময়টাতে আমরা প্রায় কার্জনে গিয়ে বসে থাকতাম, কার্জনের পুকুর পাড়ে। তেমন কিছু করতাম না। শুধু চুপচাপ বসে থাকতাম। ক্লাসের রুটিন নরমালিই ছিল। তেমন সিগনিফিকেন্ট কিছু ছিল না। কিন্তু ১-২ থেকে যেই বিষয়গুলো একুশকে ধরে বসেছিল ওইটা থেকে সবাই বার হয়ে আসতে পেরেছিলাম এরকম দাবী আমি করব না। ও আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি। আমাদের ব্যাচের নাম কেন একুশ। এই নামকরণ আমরা আসলে করেছিলাম ফ্রেশার্স এর সময়ে। ব্যানারে নাম দেয়া লাগত, অথচ নাম নাই এখনো। কতো ভোটাভুটি, অপিনিয়ন। একটা পর্যায়ে আমাদের মনে হয়, আমরা এতো লাফালাফি কেন করছি, আমরা ২১ তম ব্যাচ, একুশতম ব্যাচ, এই একুশ নামটাই তো একটা ক্লাস, একটা আলাদা ফীলের ব্যাপার। আমরা আমাদের নাম ঠিক করলাম একুশ। আমরা একুশ।

২-১ এর আরেকটা অনেক অনেক বড় প্রাপ্তি হলো, ১৯ এর সাথে পরিচিতি। আমরা খুবই লাকি, আমাদের সিনিয়র প্রতিটা ব্যাচ অসাধারণ। ১৮, ১৯, ২০ সবগুলো ব্যাচ এতো বেশি কুল, উনাদের কুলের স্ট্যান্ডার্ড বিট করা কঠিন। আর এই ক্ষেত্রে ১৯ একটা লেজেন্ডারী ব্যাচ। ভাইয়া আপুদের সাথে আমাদের ক্লোজনেস বাড়েই হচ্ছে ফ্রেশার্স এর পরে, মুনতাসিরের আরেকটা ইশতেহারের বাস্তবায়ন। এখন যেহেতু লেখা অনেক অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, আমি সবার কথা বলব না। কিন্তু একটা মানুষের কথা না বললে রক্ষা নাই।

অমিফা রাজ প্রভা আপু।

আমার জীবনে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি তোমার পছন্দের কিছু মানুষের লিস্ট দাও। এই ক্ষেত্রে প্রভা আপুর নাম থাকবে না এটা হতে পারে না। সিম্পল কথায় একজন পার্ফেক্ট মনের মানুষ, একজন বড় মনের মানুষ, একজন অসাধারণ মানুষ। এই মানুষটার



ছবি ১। ফ্রেয়ার্স উইক, কর্তৃত্বতায় দীপ্ত ।
সাথে দেখা না হলে অনেক কিছু অসম্পূর্ণ থাকত । আপুর সাথে আমার পরিচিত হবার ঘটনাটাও অনেক অদ্ভুত । আমি
একদিন চুপচাপ বসে আছি, আপু ডাকেন,
- এই পিচ্চি ট্যুরে যাবি না ?

২ - ২ঃ ফার্স্ট অল ব্যাচ ট্যুর, নবীনবরণ ও ১৯ এর চলে যাওয়া

২-২ আমার জন্য আসলে অনেক মিস্ট্রড অভিজ্ঞতার একটা সেমিস্টার। প্রথমে আমাকে দিয়েই শুরু করি। কিছু অদ্ভুত কারণে এসময় আমার মেজাজ ভয়াবহ রকম তুঙ্গে থাকত, মানে লিটেরেলি সব কিছুতে বিরক্ত। আমি এমনিতে বেশ চুপচাপ আর শান্ত ধরনের মানুষ কিন্তু এসময় আমার মেজাজ একদম সব কিছুতে তুঙ্গে। আমি আসলে অনেক অনেক কিছু শিখেছি এই সেমিস্টারে, *মানে অনেক অনেক কিছু*। আমি একটা লম্বা সময় চিন্তা করেছি, এমন কি কারণ যার জন্য এতো চেঙ্গ। কারণ বুঝি নি, এমন না। বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি পরে। তবে এখন কোন ডিটেইলড কারণে না যাই, তাহলে একদম পুরো ইতিহাস হয়ে যাবে। কিন্তু পুরোটার সারমর্ম ছিল, প্রত্যেকটা মানুষকে জীবনের একটা পর্যায়ে "বড়" হওয়া লাগে, অনেক অনেক কিছু শিখে নেয়া লাগে। স্কুল কলেজ এর সাথে তুলনা করলে ভার্টিসি অনেক ডিফারেন্ট একটা জায়গা। এই জায়গাটাতে শেখার প্রচুর জায়গা আছে। আমি শুধু একাডেমিক জিনিস বলছি না। একাডেমিক জিনিস যে কেও যে কোনভাবে শিখতে পারে, জানতে পারে। কিন্তু এটা আসলে অন্যরকম একটা জিনিস।

যাই হোক সুখ স্মৃতিতে ফিরে আসি। দুঃখবিলাস করে কি লাভ !!!

২-২ এর একদম শুরুতেই একটা অল ব্যাচ ট্যুরের আয়োজন করা হয়। আর এটা হচ্ছে *ওয়ান অফ দি বেস্ট থিং ইউ ক্যান এভার ওয়ান্ট*।

অল ব্যাচ ট্যুর।

আমি যেতে পারি নি। বাসায় একটু প্রবলেম ছিল। তবে যারা গিয়েছিল তাদের কাছ থেকে এক্সপিরিয়েন্স শুনেছি। ট্যুর পরবর্তী ইফেক্ট দেখেছি। আমি এখনো আফসোস করি যেতে পারলাম না এজন্য। তবে যেহেতু জীবন মানুষকে অলটাইম সুযোগ দেয়, তাই আমি এই সিরিজের সেকেন্ড ট্যুর মিস করিনি। আর ওটা আর যাই হোক বেস্ট না বললে গুনাহ হবে। ওটা নিয়ে পরে কথা বলব। এটাতে ফিরে আসি।

আমরা যখন ফার্স্ট ডেস্টে আসি তখন আমার কাছে কেনো জানি সবগুলো ব্যাচকে আলাদা আলাদা মনে হতো। অনেকটা প্রত্যেকটা ব্যাচ আলাদা আলাদা এনটিটি এর মতো। ফার্স্ট অল ব্যাচ ট্যুরের ইফেক্ট ছিল ভয়াবহ। এই যে সবার মাঝে একটা অদৃশ্য দেয়াল ছিল তা যেন অনেকটা রাতারাতি ধূপ করে পড়ে যায়। এর পরে সবগুলো ব্যাচের মধ্যে ইন্টারএকশন একটা শিল্পের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ২-২ অর্থাৎ ২০১৬ এর শেষ ছয়মাসের খুব সুন্দর কিছু কথা বললে এটা কোনভাবেই বাদ দেয়া সম্ভব না। এখন যে, ইন্টারব্যাচ রিলেশন এতো সুন্দর এর পিছনের অনেকটা কারণই এই অল ব্যাচ ট্যুর। আর এই ট্যুরের আরেকটা আফটার ইফেক্ট ছিল, এখন ডেস্ট এ ব্যাচ বেসড কিছু করতে গেলেও সবার আগে মনে হয় এটা সব ব্যাচ মিলে করা যায় না।

[আচ্ছা আমি এই পার্টটার টাইমলাইন নিয়ে একটু কনফিউজড, এটা ২-১ এর সময়েও হতে পারে]

বৃষ্টি।

পুরো ভার্টিসিটির সব থেকে সুন্দর কিছু জিনিসের নাম বলতে বললে, আমি অবশ্যই বৃষ্টিকে বাদ দিব না। বর্ষনস্নাত কার্জন যে কি পরিমাণ সুন্দর এটা না দেখলে আমার মতে বোঝা কঠিন। এটা সম্ভবত ২-১ এর পরীক্ষার সময়ের কথা। শেষ পরীক্ষার দিন। আমাদের সিট পড়ে কার্জনে। পরীক্ষাশেষে শুরু হলো ধূমানো বৃষ্টি। আমার তখন সিরিয়াস ঠাণ্ডা। ভেতরে দাড়িয়ে আছি কখন কমবে। ক্লাসের সব লোকজন ও অপেক্ষা করছে। এরপরে বোঝা গেল, এই বৃষ্টি কমার কোন সম্ভাবনা আগামী ঘন্টা এক দুইয়ের মধ্যে নেই। তখন, যেটা করা দরকার আমাদের একুশের মানুষজন একত্রে একটি ওটাই করল। সব বই খাতা কাগজ আমার কাছে ধরিয়ে দিয়ে নিমে গেল ভিজতে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি শুধু। **** সর্দি। তবে যেটা ভাল লেগেছিল, বৃষ্টি থেকেও বেশি, কিছু খুশি মানুষের হাসি, তাদের বাচ্চাদের মতো লাফালাফি। মানুষের আনন্দ এটা একটা দেখার মতো জিনিস। তবে এই বৃষ্টি নিয়ে আমাদের ডেস্ট এর ও একটা কাহিনী আছে। একবার লিনিয়ার অ্যালজেবরা ক্লাস নিচ্ছেন আসিফ স্যার। এ সময়ে শুরু হলো বৃষ্টি। সে যে কি শিলাবৃষ্টি। আমার যতদূর মনে পড়ে, ৪১২ এর জানালার গ্লাস ও ভেঙ্গে গিয়েছিল মনে হয় আর কারেন্ট তো নেই বৃষ্টির শুরু থেকেই। একুশের

মানুষজন নীল আর বৃষ্টিতে খুব বেশি ভালবাসে। আমার মাঝে মাঝে খুবই তাজব লাগে, এতো সেম টাইপের মানুষ কীভাবে একজায়গায় একসাথে এসে পড়ল। জগতে স্রষ্টার কোনইনসিডেনস আসলেও এক্সিস্ট করে। আর মজার বিষয়, আমি সেদিন কোন এককারণে মেহরিন এর উপ্রে সেন্টি খেয়ে গাল ফুলিয়ে বসে ছিলাম। *সাই, সাচ এ চাইল্ড আই ওয়াজ।* তো চলে আসি এবার ২-২ এর বেষ্ট(!) ইভেন্টে, নবীনবরণ ২০১৬(*নাসিসিজম? একুশ ব্যাচ হিসেবে একটু আর কি...*)। নবীনবরণের আয়োজন কীভাবে শুরু হলো এটা অবশ্যই বলা উচিত।

নবীনবরণ।

তখন সম্ভবত ঈদের ছুটি চলছিল। আমি বেলা করে উঠতাম এসময়। তো একদিন ঘুমাচ্ছি, এসময় ফোন বেজে উঠেছে। ফার্স্ট ধরি নি, সেকেন্ড বারে ধরলাম।

- হ্যালো?
- রিজভী?
- কে?
- আমি আবু স্যার। ভালো আছ?

আমি পুরো লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম। উঠেই নেটওয়ার্কের জন্য ড্রয়িংরুমে দৌড়লাম।

- আসসালামু আলাইকুম স্যার।
- ঘুমাচ্ছিলো মনে হয়
- জি স্যার একটু।
- নবীন বরণের তো ডেট ফিক্স হয়েছে, কিছু প্ল্যান করছ?
- না স্যার, জানতাম না তো। আমরা তো ভাবছি হবে না এবার।
- না না, হবে। খোলার পরপরই আমাকে বাজেট দিবা। আর অল্পকদিন আছে ঠিকমতো প্ল্যান করো। বেশি দিন কিন্তু বাকি নাই। খোলার পরে শুধু এক সপ্তাহ সময় পাবা।

আমি পুরো আকাশ থেকে পড়লাম।

তো এর পরে শুরু হলো তোরজোড় আর শেষ পর্যন্ত হয়েও গেল নবীনবরণ। এর মধ্যে যে আমারদের যে কতবার মনে হলো, *বাদ, এসব করার কোন মানে নাই, করব না নবীন বরণ। আশ্চর্য কেও পারফরম করবে না কেন, নবীন বরণ কি আমার। সব কাজ ও কেন করবে, কাজ ভাগ করা হয়েছে না, আবার কী। ও কথা শুনে না কেন।*

তবে নবীনবরণ এতো সুন্দর করে শেষ করার পিছনের মূল কারিগর ছিলো সামি আর নবনী। যখন, আমাদের শিবির পুরোপরি কাজের চাপে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত আর ভঙ্গুর তখন এই দুইটা মিলে পুরোপরি একা ফুল ইভেন্টটা সামলিয়ে গিয়েছিল। সবাইকে আবার ঠিক ঠাক মতো নিজের প্লেসে বসালো, কাজ গুলো আবার ঠিক মতো ডিস্ট্রিবিউট করলো, ইভেন্টটা নামালো। এইদুইটা আসলেই জেম। ইভেন্ট নিয়ে স্পেসিফিক ভাবে বলার কিছু নেই। খুবই সুন্দর সময় গিয়েছে। হ্যা, কিছু কথা কাটাকাটি ছিল,বিবাদ,রাগারাগি,ভুল বোঝাবুঝি ছিল। এগুলো আসলে ইভেন্ট এরই অংশ। সবাই মন থেকে চেয়েছে নিজের পার্ট থেকে যতটা সম্ভব যাতে কন্ট্রিবিউট করা যায়। কোন ইভেন্টই আসলে পারফেক্ট না। স্পেশালি নিজেরা কিছু আয়োজন করলে তো খুঁতখুঁত থাকেই। এটা হলো না, ওটা আরেকটু ভাল করা যেত, এই দিকটায় ফোকাস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু দিনশেষে যেটা থাকে সেটা হলো মনে রাখার মতো ভালো মুহূর্তগুলো। আর আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ এজন্য সৃষ্টার কাছে।

তো আমি আগে ও বলেছি ২-২ এর লাস্টে এসে আমি "সেন্টিম্যান" হয়ে গিয়েছিলাম। তো সেই সেন্টি দূর করতে *জিন্দেগী না মিলেগা দোবারা* দেখে কক্সবাজার গিয়েছিলাম পরীক্ষার শেষে। আর এভাবেই ২-২ এর গল্প শেষ।

৩-১: নতুন

কক্সবাজার আমার এমনিতে বেশ পছন্দের একটা জায়গা। সমুদ্র আর আকাশ এই দুইটা জিনিসই আমার বেশ পছন্দের আর কক্সবাজার তো আসলেই এই দুইটারই কন্ট্রিনেশন বলতে গেলে। এ পর্যন্ত বহুবার কক্সবাজার যাওয়া হয়েছে, অনেক বাদটাদ দিয়ে বললেও আট থেকে নয় বার তো হবেই। কিন্তু সেবারের মতো ভাল লাগা আমার আসলেই আগে কোনবার লাগে নি। এর কারণ মুক্তি ইফেক্ট ও হতে পারে আবার আমি যেহেতু সেন্টার পিক লেভেলে চলে গিয়েছিলাম ওটার ইফেক্ট ও হতে পারে, সিউর না কোনটা। তিনদিনের মতো ছিলাম, দিনে তিনচার বার সাগরে ডুব দিতাম, প্রতিবার ডুব দিয়ে উঠার পরে কিছুক্ষণ বীচে একদম চুপচাপ বসে থাকতাম সাগরের দিকে তাকিয়ে। আমি জানি না, কেন জানি এক অদ্ভুত ভাল লাগা কাজ করত। নিঃশব্দতা আর বিশালতার একটা অদৃশ্য আর অপরূপ সৌন্দর্য আছে, ওগুলোকে ব্যাখ্যা করার মতো শব্দ আমার জানা নেই। তো একটা ছিমছাম ট্যুরের পর আবার ঢাকা চলে আসলাম। এসে দেখি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টের গ্রুপ করে প্রজেক্ট দেয়া ও শেষ। *হতাশা ইন্টেনসিফাইস।*

৩-১ এ আমি বেশ চুপচাপ থাকতাম। আমি এমনিতেও চুপচাপ মানুষ। কিন্তু ওই সময়ে একটু বেশিই চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলাম। তেমন কথা বলতে ইচ্ছে করত না। সোজা কথায় এসময় আমি পুরো দার্শনিক হয়ে গিয়েছিলাম অনেকটা। সারাদিন শুধু মানুষের সাথে স্তানগর্ভ কথাবার্তা বলতাম। ডেফিনিটলি পড়াশোনা নিয়ে না, জীবন নিয়ে। আর দেখলাম আশেপাশের মানুষ ও বেশ ইন্টেরেস্টেড। তবে অনেক অনেক ডিপ আলোচনার মধ্যে একজনেরটা বলি। তিনতলার গার্লসকমন রুমের সামনে একটা জুতার সট্যান্ড থাকত এসময়ে। সবাই সোফা থাকতেও ওটার ওপরে গিয়ে বসত আর কোন ম্যাডাম বা স্যার আসলে লাফ দিয়ে নেমে যেত আর গেলে আবার উঠে বসত। তো এই উঠাবসার মধ্যেই দীপ্তর সাথে একদিন কথা বলছিলাম। দীপ্তর ব্যাপারে কিছু বলা উচিত। এই ছেলেটা আমার দেখা এখন পর্যন্ত সবচাইতে বেস্ট ফটোগ্রাফার (*আমার সার্চ স্পেস অনেক কম*)। ওর ক্রিয়েটিভিটি, ট্যালেন্ট আর অলসতা যে কোন লেভেল এর এটা ওকে কেও না দেখে থাকলে জানবে না। ওর আরেকটা কোয়ালিটি হচ্ছে কংক্রিট মতামত দেয়ার ক্ষমতা। এটা আসলেও একটা রেয়ার কোয়ালিটি। সেদিন ওই শু স্ট্যান্ডের উপর বসে অনেক কথা বলেছিলাম ওর সাথে। আমার জীবনের অনেক পছন্দের কনভার্সেশন গুলোর মধ্যে এটা একটা।

এরপরে আসি গিফট নিয়ে। আমি মোটেও ও কোন গিফট দেয়া মানুষ ছিলাম না। কিন্তু কি জানি হঠাৎ কি মনে করে প্রচুর গিফট দেয়া শুরু করলাম। শুরুটা ও একটা পাগলামী দিয়ে। সম্ভবত ২-২ এর শেষের দিকের ঘটনা এটা, কারণ প্রভা আপুরা তখনো ছিলেন। একদিন ডেন্ট এর সব মানুষ মুক্তি দেখতে যাবে, *আয়নাবাজি*। ওই যে অল ব্যাচ ইভেন্ট। তো সেদিন নিতুর মন ভয়াবহ খারাপ কোন একটা কারণে। সবাই মুক্তি দেখছে আর মেয়েটা পুরোটা সময় মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। আমার পাশেই বসেছিল, এই স্যাড অবস্থা না দেখে কোন উপায় ও ছিল না। সবাই মুক্তি দেখতে বলাকায় গিয়েছিলাম। ছবি শেষ করার পরে কি মনে হলো, নীলক্ষেতের এক দোকানে ঢুকলাম, একটা বই কিনে ওর ব্যাগে চুপচাপ রেখে দিয়ে চলে আসলাম (এই মেয়ে বই পড়তে অনেক পছন্দ করে)। এই থেকে গিফট দেয়া শুরু। এরপরে কতবার যে এই আকাম করেছি। এতে সবচেয়ে বড় ঝামেলা যেটা হয়েছিল, একবার একজন এভাবে তার ব্যাগের মধ্যে গিফট পেয়েছে। তার পুরো বিশ্বাস এটা আমার কাজ। এটা যে আমার কাজ না এটা বোঝাতে যেই কষ্ট হয়েছিল।

এরপরে আমাদের একুশের পিকনিক। যেহেতু আবার ব্যাচ ইভেন্ট তাই অ্যারেঞ্জ করার গুরুদায়িত্ব আবার সামি, নবনী এর উপরে। আর সাথে ছিল সাকিব আর আশরাফ। এই চারটা মানুষ মিলে পুরো ইভেন্টটা নামালো, স্পট ঘোরা, খাবারের ব্যবস্থা করা আর আনুষ্ঠিক যা যা লাগে। আমাদের সবার কাজ যোগ করলেও এদের চেয়ে কম হবে সিউর। পিকনিকের সবচাইতে জোস পার্ট ছিল শেষের পুরস্কার দেয়ার অংশটা। এতো জীবন্ত ছিল পুরো সময়টা। আর মূল কথা হচ্ছে

চারপাশের আবহটা। এতো মায়াবী ছিল সবকিছু। আমার খুবই পছন্দের কাজ হচ্ছে তৃতীয় পার্সন হিসেবে সবকিছু দেখা। দূর থেকে কিছু সুখী মানুষের আনন্দ দেখার মাঝে ও এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি আছে। এক অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করে।

এবার বলব, আমার জীবনে দেখা সবচাইতে আনন্দের গানের কলির আসর নিয়ে। পিকনিক থেকে ফেরার পথে একুশের সব মানুষ আর জামি স্যার, আসমা ম্যাম, তমাল স্যার একবাসে উঠলাম। এরপরে ঠিক হলো গানের কলি খেলব। ভাগ হবে ইভেন আর অড দিয়ে। এরপরে, ইভেন গ্রুপের একটিভ মেম্বর হলো, তমাল স্যার, আসমা ম্যাম, রাগিদা, সামি, বুলবুল আর ইভেন এ জামি স্যার, আমি, ঋদ্ধ, মেসবাহ। গেম এর রেজাল্ট না জানাই ভাল।

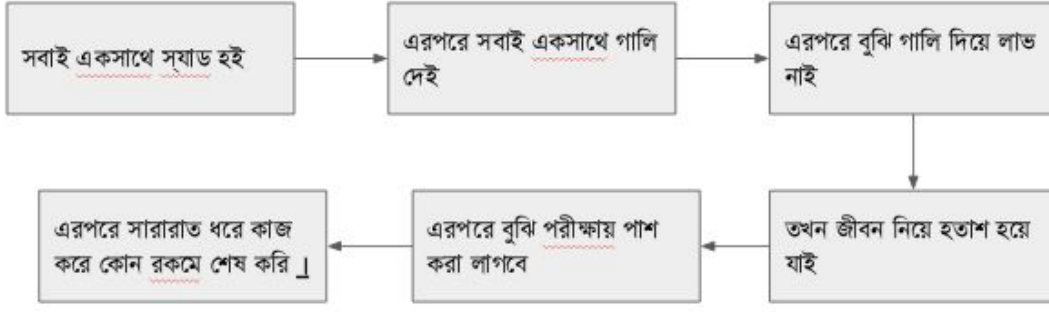
৩-১ এর আরেকটা মনে রাখার মতো ইভেন্ট হলো ডিউ এই আইসিপিসি কনফারমেশন, ডিউ সেনসর্ড। অনেক অনেক বছর ধরে আমাদের ওয়ার্ল্ড ফাইনালস যাওয়া হচ্ছিল না। সেবার ভাইয়ারা পুরোপুরি আটঘাট বেঁধে নেমেছিলেন। শাহেদ ভাই, তন্ময় ভাই আর জাহিন ভাই। উনারা তিনজনই জোস। কিন্তু একজনের নাম স্পেসিফিকালি বলাই লাগে। জাহিন ভাই। জাহিন ভাই যে কি অসাধারণ লেভেল এর একজন প্রবলেম সলভার এটা বোঝানো বেশ কঠিন একটা কাজ। উনার ডেডিকেশন পুরোপুরি অন্য লেভেলের। ভাইয়ার ইউভিএ স্ট্যাট পেজ আমার বাসায় লোড হয় না, বেশি ডাটার জন্য। তো পুরা ডেপ্ট এর মানুষজন যে কি পরিমাণ খুশি হয়েছিল ওই সময়ে। আমার এখনো মনে পড়ে, যেদিন ডিক্লেয়ার হলো, সেদিন জামি স্যার রুমে রুমে গিয়ে জানাচ্ছিলেন এই খবর। আমাদের সেদিন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট এর একটা প্রজেন্টেশন ছিল। ঋদ্ধ ডায়াসে। ওই সময় স্যার গেট খুলে ঢুকে তারেক স্যার কে বলেছিলেন,

- স্যার একটা খবর ছিল
- কি ?
- আমরা এবার ওয়ার্ল্ড ফাইনালস যাচ্ছি।

এরপরে মানুষ এর চিল্লাপাল্লা থামায় কে। আর এভাবেই আস্তে আস্তে ৩-১ এর ঘটনা শেষ।

৩-২: বার্ষিক্য

কথায় বলে, মানুষ বুড়ো হয় মনে আগে শরীর পড়ে। ৩-২ হচ্ছে পুরনো অ্যাকাডেমিক রুটিনের সবচাইতে ব্যস্ত সেমিস্টার। এই সময়ের কোর্সগুলো ও কঠিন আর কাজও প্রচুর। ল্যাব এর পরিমাণ ও অনেক। আরেকটা কথা আছে না যে, বয়স বাড়লে শরীরে তেল জমে। নড়তে চড়তে মন চায় না। একুশের অবস্থাও ওই সময়ে এরকম হয়ে গিয়েছিল। কোন একটা কারণে এ সময়ে সবাই একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। ছুটির দিনে শুধু বাসায় থাকতে মন চাইত সবার। এসময়ে হ্যাংআউট এর পরিমাণ অনেক বেশি কমে গিয়েছিল। আমরা এতটাই বুড়ো হয়ে গিয়েছিলাম, যখন নবীন বরণ করে বাইশ তখন আমাদের পার্টিসিপেশন বলতে গেলে একেবারেই ছিল না। আর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের অনার্স লাইফের এটাই ছিল শেষ নবীনবরণ। এরপরের বছরের নবীনবরণ(২০১৮ এর টা) ক্যাম্পেল হয়ে গিয়েছিল (যখন লেখা হয় তখন পর্যন্ত ঠিক ছিল যে হবে না এবছর)। একুশ একটু বেশিই মারা খাওয়া ব্যাচ। আমাদের ব্যাচের একটা অদ্ভুত ফ্লোচার্ট আছে। এটা অনেকটা এরকম,



ছবি - আমাদের ফ্লোচার্ট

এবার বলি আমার ভার্শিটি জীবনের প্রথম ট্যুর নিয়ে। আমি একজন এক্সিডেন্ট প্রবন মানুষ। জীবনে যে কতভাবে কতপ্রকারে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। হতেই থাকে শুধু। আর তাই বাসার মানুষজন ও বেশ টেনশনে থাকে আমাকে নিয়ে। তো ২০১৬ এর মতো ২০১৭ সালেও ঠিক হলো যে একটা অল ব্যাচ ট্যুরের আয়োজন করা হবে। আর এবার কোঅর্ডিনেশনে দি গ্রেট ফাহিম ভাই। তখন সবার সাজেক যাওয়ার চল। আমরাও ঠিক করলাম সাজেক যাব। আগের বারের অল ব্যাচ ট্যুর যেহেতু অনেক বেশি কোপ ছিল তাই এবার লোকজন যাওয়ার রেট এমনতেই অনেক বেশি। আর সবাইকে দেখে বাসায় বেশ মারামারি করে আমিও এটলাস্ট রাজি করাতে পারলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম ৪৪ জন!!!!। আমরা যেই বাস রিজার্ভ করেছিলাম ওটাতে সিট ছিল ৪৩ টা...

আমার ভার্শিটি লাইফের প্রথম ট্যুর। সাজেক ট্যুর।

এই ট্যুর নিয়ে আমি লিখে শেষ করতে পারব না। সাজেক এক অনন্য সুন্দর জায়গা। কিন্তু এই ট্যুরটাতে সাজেককেও ছাড়িয়ে গেছে মানুষগুলো। আমি লিখে দিতে পারব এই মানুষগুলো না থাকলে ট্যুরটা কোনদিনই এতো সুন্দর হতো না। রাতের হাইওয়ে আমার অনেক পছন্দের। স্পেশালি যখন, বাস একদম উন্নত বেগে ফাঁকা রাস্তা ধরে আগাতে থাকে। আমি হয়তোবা বাসের একদম সামনের সিটে বসে এই ফাঁকা রাস্তার দিকেই সারাটা জীবন তাকিয়ে থাকতে পারব। আমরা যেদিন সাজেক যাই ওই দিনের আকাশটা অদ্ভুত রকম সুন্দর ছিল। পুরোটা আকাশ তারা দিয়ে ভরা। একদম স্বচ্ছ আকাশ আর তার মাঝে লক্ষ তারা। আমরা ফুল স্পীডে ছিলাম তাই কোন ছবি তুলে রাখা হয় নি। আর মজার ব্যাপার হলো সাজেকে যখন ছিলাম তখন পুরো আকাশ ছিল মেঘলা। সাজেকে আমি ছিলাম মোটে দেড় দিন। কিন্তু এই দেড় দিনে মনে রাখার মতো যে কতো স্মরণীয় জমে আছে। স্পেশালি রাতের বেলাটা। আমরা সন্ধ্যায় এক পশলা ভূতের গল্পের আসর শেষ করে খেয়ে দেয়ে ঘরে ফিরলাম রাত এগার টার দিকে। সাজেকে যেহেতু নরমাল কারেন্ট নেই আর সবাই মোটামুটি তেল খরচ করে জেনারেটর চালায় তাই রাতের বেলায় আলো এমনতেও বেশ কম আর তার উপরে তখন ছিল আকাশে প্রচণ্ড রকম মেঘ। ফলাফল রাতের বেলায় এক হাত দূরে ও ঠিক মতো কিছু দেখা যাচ্ছে না। মানুষজন সব ঠিক করলো কেও সূর্যদয় না দেখে ঘুমাবে না। প্রথমে ঘন্টা দুয়েক মানুষ গেমটেক খেলল, কেও বা ঝিমাল। এরপরে রাত দুইটা বা আড়াই টার দিকে ঠিক হলো সবাই হ্যালিপ্যাডে গিয়ে ভূতের গল্প করব। যা ভাবা তাই কাজ। এরপরে ২০-২৫ জনের দল রওনা দিল এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে হ্যালিপ্যাডের দিকে। এরপরে চলল এক লম্বা চড়া ভৌতিক, আধাভৌতিক, পরাকৃতিক, অপরাকৃতিক, বানান গল্পের আসর। আসলে মূল কারণ ছিল পরিবেশটা। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আকাশে একটা বিমর্ষ চাঁদ আর একসাথে বসে থাকা কিছু মানুষ। অনেক টা যেমন গল্প উপন্যাস থেকে তুলে আনা একটা অংশ। যখন সবাই বুঝলাম, একটু রেট বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন ঠিক হলো কিছু গান বাজনা হোক। গীটারে শুধুমাত্র একটা স্ট্রোক দিতে না দিতেই বিডিআর আমাদের হ্যালিপ্যাড থেকে ভাগিয়ে দিল।

দীপ্ত সাজেকে আসার পর থেকেই একটা ভাল ফ্রেম খুঁজছিল। হঠাৎ যেন এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে সেই ফ্রেম পেয়ে যায়। অনেক চেষ্টা টেষ্টা করে মোবাইলের আলো দিয়ে কেরেশমাতি করে এরপর ওর ছবি তোলা হলো। তো এখন যেহেতু ক্যামেরা ওর হাতে আর লাইট কীভাবে দিতে হয় সেই আইডিয়াটাও হয়ে গেলো, এরপরে আর মানুষকে প্রোফাইল পিকচার তুলা থেকে আটকাই কে। যতক্ষণ ক্যামেরায় চার্জ ছিল ততক্ষণ ছবি তোলা চলল।

এরপরে আসল সূর্যদয়ের সময়টা। সাজেকে সূর্যদয়ের সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। পুরো ব্যাপারটা আসলে কয়েকটা সেগমেন্টে বিভক্ত। প্রথমে আস্তে আস্তে চারপাশের মেঘগুলো হালকা হতে থাকে আর আস্তে আস্তে দূরে যেতে থাকে। ওই সময়টা থাকে বেশ ঠাণ্ডা। এরপরে আস্তে আস্তে মেঘের আস্তরণ ফুটো হয়ে অল্প অল্প আলো বের হতে থাকে। আর একদম শেষে পুরো মেঘের উপরে এক মিঠা হলুদ রংয়ের আবরণ ছড়িয়ে পড়ে। পুরো ব্যাপারটা একদম ছবি আঁকার মতো। আস্তে আস্তে একজন শিল্পী যেন রং মিশান, এরপরে সেই রং ছড়িয়ে দেন আর আস্তে আস্তে রংটা শুকিয়ে যাবার পরে পুরো ছবিটা ভেসে উঠে।

অনেক অনেক সুন্দর মেমোরি নিয়ে একটা সময়ে সাজেক ট্যুর ও শেষ হয়ে গেল। এই ট্যুরে আমার আরো তিনজন অসাধারণ আর কুল মানুষের সাথে পরিচয় হলো। মালিহা আপু, ইরানা আপু আর বর্ণা আপু। মজার ব্যাপার হচ্ছে খার্ড ইয়ারে উঠার আগ পর্যন্ত আমার কোন কথাই হয় নি উনারদের সাথে.....।

এবার একটা স্যাড চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলি ৩-২ এর। এসডিপি প্রজেক্ট নিয়ে। আমি মনে হয় আমার লাইফে এখন পর্যন্ত এতো ডেডিকেশন নিয়ে কোন প্রজেক্ট করি নি। মোটামুটি একমাসের মতো দিন রাতে খেটে না ঘুমিয়ে প্রজেক্ট করেছিলাম। ওয়েব রিলেটেড প্রজেক্ট ছিল আর কিছুই পারতাম না এটা রিলেটেড, তাই অনেক অনেক জিনিস শেখা লেগেছিল। এতো ভয়াবহ ইফোর্ট দিয়েছিলাম যে আইসিপিসি এর জন্য কোন প্র্যাকটিসই করি নি আর বেশ ভাল মাসুল ও দিতে হয়েছে এজন্য আর এতো বেশি ইফোর্টের ইফ্যাক্ট ও মোটেও সুখকর ছিল না আলটিমেটলি। তো এই হতাশা, স্মৃতি অনেক কিছু নিয়ে ৩-২ শেষ।

৪-১: শেষের শুরু

আসলে চার এক এর শুরু থেকেই সবাই থিসিস নিয়ে বেশ প্যারার মধ্যে ছিল। থিসিস সুপারভাইজার ঠিক করা, টপিক, পার্টনার ঠিক করা, পুরো জিনিসটা নিয়েই সবাই বেশ ভাল একটা সময় ব্যস্ত ছিল। এগুলো ঠিক করার পরপরই দেখা গেল আস্তে আস্তে ভার্শিটির অবস্থা বেশ গরম হয়ে উঠছে নানা আন্দোলনের কারণে। স্পেশালি কোটা বিরোধী আন্দোলন। অনেক ক্লাস বর্জন, মানববন্ধন, ছাত্রলীগ, পুলিশ আর সাধারণ স্টুডেন্টসদের মারামারি সবকিছু মিলিয়ে বেশ ভাল একটা সময় পরিবেশ অনেক গরম ছিল। আমাদের ভার্শিটিতে তো এমনিতেই ছাত্রলীগের অনেক দৌরাত্ন স্পেশালি হলগুলোতে। অনেকে আশা করেছিল হয়তোবা অনেক সুন্দর কোন চেঞ্জ আসবে। কিন্তু তা হয়নি আসলে আর শেষটা আসলে বেশ হতাশাব্যঞ্জকই ছিল। তবে একটা জিনিস সত্য, আন্দোলন যখন একদম পিক পর্যায়ে তখন ভার্শিটির যেই রূপ আমি দেখেছি ওই রূপ দেখতে পারা অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমাদের ভার্শিটি আসলে অনেক বেশি বড়, এখানে সবচাইতে বেশি যেই প্রবলেমটা হয় সেটা হলো সবাইকে এক করতে পারা। এতো বেশি মানুষকে এক করে সেম প্লাটফর্মে নিয়ে আসা চারটি খানি কথা না। আর নেতৃত্ব দেয়ার গুণ অনেক বড় একটা গুণ। এই গুণ সবাই নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে সবচাইতে কাকতালীয় ব্যাপারটা হলো, আমরা যখন ২০১৫ তে আসি ওসময়েও দেশের অবস্থা বেশ অশান্ত ছিল আর আমাদের যাওয়ার সময়েও, *পুরা দে-জা-ভু*। আরেকটা ব্যাপার হলো, আমরা অনেক তোরজোড় করে আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ আস্থা গুণাপন করে ২০১৮ এর পহেলা বৈশাখ বর্জন করলাম। আর আস্তে আস্তে যখন পহেলা বৈশাখের দিন চলে আসল, সেদিন দেখলাম আমরা আর আই.আই.টি. বাদে মোটামুটি সব ডেপ্ট ই পালন করছে। তখন আর কি করার হতাশ হয়ে

এতিমের মতো ভাসিটি এলাকা চষে বেড়িয়েছিল মানুষ। আর সেদিন শিক্ষা হয়েছিল, পাবলিক সেন্টিমেন্ট অনেক কঠিন এক জিনিস।

আরেকটা স্পেসিফিক শর্ট ট্যুরের কথা বলাই লাগে। ফুলকী ট্যুর।

ফুলকী চটগ্রামের একটা স্কুল। জাবের স্যার প্রতিবছর ওই স্কুলে সিএস রিলেটেড বিভিন্ন ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করেন। আগের বছরেও স্যার আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্যার কে হেল্প করার জন্য। এবারো জানালেন, আমরা কেও যেতে ইচ্ছুক কিনা। তো আগের বারের এক্সপিরিয়েন্স বেশ সুন্দর ছিল তাই যারা গিয়েছিল তারা কেও আর না করেনি আর সাথে এবার আমরা আরো কজন গেলাম। আমরা গিয়েছিলাম মোট ১৩ জন, দীপ্ত, রাঈদা, ঋদ্ধ, মুনতাসির, আমি, জাদিদ, বুলবুল, নাবিল, সামিন, নিতু, সামি, শাহীন আর মেহরিন।

স্কুলের এক্সপিরিয়েন্স বেশ সুন্দর ছিল কিন্তু তার থেকেও বেশি সুন্দর ছিল আমাদের ঘোরাঘুড়ি আর বাংলাদেশের ম্যাচ। আমরা সবাই একটা লম্বা সময় পুরো কাপ্তাই লেক এ ছিলাম। আমি আগেও বলেছি নীরবতার একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে আর ওটা কীভাবে জানি সবাইকে গ্রাস করে ফেলে। আমরাও সেদিন হারিয়ে গিয়েছিলাম ওই স্লিঙ্ক নীরবতার মাঝে। আর ছিল লাইফের ফার্স্ট কায়াকিং!

আর ছিল ম্যাচ!!। আমার জেনারেলি বাসায় বসে চুপচাপ খেলা দেখা হয়। কিন্তু সবার সাথে বসে একসাথে চিল্লিয়ে খেলা দেখার যে কি মজা সেটা সেদিন বুঝতে পেরেছি। সবাই মিলে একসাথে গালি দিতেও শান্তি লাগে। আর তার ওপর সেদিন বাংলাদেশ জিতেছিল।

খুব ছোট্ট একটা সুন্দর ট্যুর আর সময়ের পরে আবার এই ১৩ জন ঢাকায় ফিরে আসলাম।

৪-১ এ আসলে আর তেমন আহামরি কিছু ছিল না। তবে হা, আমরা আমাদের প্রথম ব্যাচ বেসড ডিনার করেছিলাম এসময়ে। চার বছরের ফার্স্ট ব্যাচ বেসড ডিনার। আর আস্তে আস্তে রিভার্স কাউন্টডাউনের দিকে আগিয়ে যাচ্ছিলাম। এভাবেই ৪-১ এর এর ছিমছাম দিনগুলো শেষ হয়ে যায়।

৪-২: একুশ

নস্টালজিয়া।

নস্টালজিয়া অনেক বাজে একটা জিনিস। জিনিসটা কেমন জানি অদ্ভুত। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু হঠাত হঠাত ভেতরটা কীরকম জানি মুচড়ে উঠে। তখন ভাল লাগে না আর কি।

আমি জেনারেলি একটু ইমোশনাল টাইপের মানুষ। আর আমি পছন্দ করি এই জিনিসটা। আমাদের চারপাশ এমনিতেও প্রচুর পরিমাণে যান্ত্রিক। এতোটা বেশি যান্ত্রিক যে, মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আর কোন হাই কনফিগারেশন এ আই বেসড রোবটের মধ্যে আসলে খুব একটা বেশি পার্থক্য নেই। যদি আসলেই কিছু পার্থক্য করার মতো জায়গা থাকে তাহলে সেটা হলো আমাদের ইমোশন এর জায়গাটা।

আমি বেশ বেশ সকাল সকালই ডেপ্টে যাই। এখন একটু দেরি হয়। কিন্তু একটা সময় ডেপ্ট এর নীচের কেঁচিগেট খোলার আগেও চলে যেতাম ছোট বোনকে স্কুলে নামিয়ে। মোটামুটি ৩-২ পর্যন্ত এটা বেশ কন্টিনিউয়াস ছিল। এখন একটু দেরিতে যাই। যখন আগে যেতাম তখন দেখতাম হোসনেআরা আপুও অনেক সকাল সকাল আসতেন। এমন হতো একদিন আমি আগে অন্যদিন আপু আগে। কেমন জানি একটা অদৃশ্য কম্পিটিশন ছিল আমাদের মধ্যে। এখন মোটামুটি আমাদের ব্যাচের মধ্যে আগে আসে সাকিব। তারপরে আমি। এসে দুইজন চা খেতে যাই। এর কাছাকাছি সময়ে রেদোয়ান আসে। এরপরে চিন্ময়। পুরো জিনিসটা কেমন জানি একটা রুটিনের মতো হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের গার্লস গ্যাং আসে, মেহরিন, রাঈদা, নিতু। এসেই নিতু পানি ভরতে যায় আর তারপরে ক্লাস শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এরা কমনরুমে গিয়ে চিল করে। সাকিব মোবাইল টিপে। আর আমি শুধু সবাইকে দেখি।

আস্বে আস্বে একেকজন মানুষ আসতে থাকে । প্রত্যেকের বসার জায়গাটাও কীভাবে জানি ফিক্সড হয়ে গেছে । বলতে হয় না । তার জায়গাটা ফাঁকা রাখে বাকিরা । রাগিদা জানালার পাশে, শাহীন ওর পিছনে । রাগিদার পাশে রেদোয়ান, ওর পাশে সাকিব, নবনী । নিতু আমার পিছনে ওর পাশে মুনতাসির, ওর পাশে মেহরিন, নাবিল । ওদের পিছনে সামিন । দীপ্ত, বুলবুল এম এম আর গ্যাং আসে একটু পরে ।

পুরো জিনিসটাই কি অদ্ভুত একটা সিকুয়েন্স মেইনটেইন করে । এই যে এই মানুষগুলোর চেহারা প্রতিদিন দেখি আর অল্প কিছু দিন পরে এদের দেখব না এভাবে প্রতিদিন , এটা মানতে একটু কষ্ট হয় আর কি । মানুষ রুটিনে আটকা পরে । রুটিন থেকে বাইরে বের হওয়া অনেক কঠিন । রুটিনের মধ্যের মায়া আরো ভয়াবহ একটা কিছু । চারটা বছর আগে একটা মানুষকেও চিনতাম না । চারটা বছর পরে এদেরকে ছেড়ে যেতে আসলেই কষ্ট হচ্ছে ।

সাকলাইন এর সাথে কতো আউলফাউল জিনিস নিয়ে কথা বলি প্রতিদিন, সামিনের কতো অদ্ভুত লাফালাফি দেখি, রাগিদাকে দিনে কতো কতোবার কেমন আছিস জিজ্ঞেস করি , শাহীনের সাথে কতো হতাশা নিয়ে কথা বলি প্রতিদিন, দীপ্ত ক্লাসের মাঝে আসলে ওকে রিক্যাপ দেই এতদিন পরশ্বস্ত কী পড়ানো হয়েছে, জাদিদের কাছ থেকে প্রতিদিন এটা ওটা শিখি, মুনতাসিরের সাথে একটু পর পর চা খেতে যাই, মেহরিনকে একটু পর পর বলি চল বাইরে যাই আর ও একই উত্তর দেয় "উঠতে ইচ্ছা করতেছে না রে ", নীতুর কাঁধে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকি, সজীবের সাথে বাসে রিকশায় যাওয়ার সময় কতো বিচিং করি । লিখে শেষ করতে পারব না আসলে । প্রতিটা মানুষের সাথে স্মৃতিগুলো এতো বেশি করে জড়িয়ে গেছে, লিখে ডিটেইলস শেষ করতে পারব না আমি । একজনকে লিখলে শুধু আরেকজন বাকি থেকে যায় । যত লিখি তত মনে হয় আরেকটু লিখি, ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না সম্ভবত আমি কি বলতে চাই ।

মাঝে মাঝে আমি ক্লাসে একা বসে থাকি । চারদিকের ফাঁকা চেয়ারগুলো দেখি । স্পেশালি বুধবার সকালে ৪:১২ তে । ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ পরসেসিং এর ক্লাস থাকে এসময় । আমাদের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস এই রুমে ছিল । এই রুমটার প্রতি আমাদের আবেগ একটু বেশি । চারদিকে তাকিয়ে আগের জমে থাকা রেকর্ডগুলো চালাই । ব্যাপারটা হচ্ছে, জিনিসগুলো জিনিসের জায়গাতেই আছে শুধু সেগুলোর সাথে কিছু মানুষের মেমোরি জমে গেছে আর কি ।

একবার দীপ্ত একটা কথা বলেছিল (এই ছেলেটা আসলেই অনেক অদ্ভুত সত্য কথা বলে ফেলে ধূপ করে) পিকনিক থেকে ফেরার পথে । প্রত্যেকটা মানুষের সেলফ বিলঙ্গিনেস এর একটা জায়গা লাগে । যেই জায়গাটায় তাকে দরকার । যে জায়গাটায় সে না থাকলে কিছু মানুষ তাকে মিস করবে, তাকে খুঁজবে, তার না থাকার কারণ জানতে চাইবে । একুশ আমার জন্য সেই জায়গা ।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের লাস্ট ইয়ারে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে অনেকগুলো বড় বড় ইভেন্ট বাদ হয়ে গিয়েছিল । নবীনবরণ,পহেলা বৈশাখ কোনটাই আমরা পাই নি সেই বছর। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা তো লাস্ট ইয়ারের নবীনবরণে ওভাবে পার্টিসিপেট ও করি নি আর কাকতালীয়ভাবে সেটাই আমাদের অনার্স লাইফের শেষ নবীনবরণ হয়ে গেল । আর নবীনবরণ ক্যাম্পেল হওয়ার ঘটনাটাও বেশ অদ্ভুত । ধূপ করে অনুষ্ঠানের দুই দিন আগে বাদ হয়ে যায় । জেনারেলি যেই ব্যাচ বের হয়ে যায়, ওই বছরের নবীনবরণে সেই ব্যাচের একটা বড় আর গর্জিয়াস সেগমেন্ট থাকে, একুশের সেই সেগমেন্ট আর করা হয় নি । সজীবের তো কতো প্ল্যান ও ছিল, "পুরনো সেই দিনের কথা" বাজাবে আর আমরা ধীরে ধীরে স্টেজে এ উঠে বসব । সব আশায় গুঁড়ে বালি । নবীনবরণ না হওয়াতে অবশ্যই একটু একটু দুঃখতো কাজ করেই । কিন্তু হঠাত করে একটা সুযোগ চলে আসে, ঐ দিনটার কথাও অবশ্যই বলা উচিত ।

এটা হচ্ছে, আমাদের থিসিস তৃতীয় দফা ডিফেন্স বা প্রি ডিফেন্সের দিন । মুনতাসির, মেহরিন আর রাগিদা মিলে সেদিন খাওয়াবে ঠিক করে । পুরা ২৬-২৭ জনের টিম হাজির খেতে । খেতে খেতে সবাই খেয়াল করে এখানে একটা স্টেজ আছে আর সেখানে ইন্সট্রুমেন্ট ফিট করা । আমাদের সাথে বুলবুল,সজীব । আর কি লাগে । আর বোনাস হিসেবে আমি,রাগিদা ।

সুন্দর সুন্দর জিনিস আসলে ধূপ করে চলে আসে আমাদের জীবনে । সেদিনের সময়টা এতো বেশি ভাল ছিল । হঠাত লোকজন একদম ইমোশনের পিকে চলে গিয়েছিল । আচ্ছা সবারটা যেহেতু আমি জানি না, সেহেতু এটা ক্লেইম করছি না । আমি গিয়েছিলাম সেটা বলতে পারি । আর এটালস্ট সজীবের সেই প্ল্যান । আর আস্বে আস্বে খুব সুন্দর একটা দিনের শেষ । ততদিনে অবশ্য আমাদের রিভার্স কাউন্ট ও শেষ হবার পথে ।

আমরা আসলে হঠাত বড় হয়ে গেছি । সেই ফার্স্ট ইয়ারে আমরা যেটা করতাম, সারাদিন ভার্শিটি এরপরে বাসায় এসেই ফেসবুক । কতো ফটো কमेंট, কতো চ্যাট, কত যে তেল ছিল আমাদের । আস্তে আস্তে মানুষজন সেমিস্টার পার করতে লাগল আর এতো তেল আস্তে আস্তে বের হতে লাগল । এখন পাশের বারে শুধু অনলাইন এটাই দেখা যায় । কোন চ্যাটগ্রুপই তেমন একটিভ না । সবাই ব্যস্ত । সবাই ক্লান্ত ।

আমাদের ভার্শিটি লাইফের প্রথম পরীক্ষা ছিল কম্পিউন্টার ফান্ডামেন্টালস । সাবজেক্টটা বিরক্তিকর । স্লাইডের পর স্লাইড মুখস্থ করা লাগে । তো সেই পরীক্ষায় জাদিদ বাঘের ছবি ঐকে আসছিল আর এখন সেই জাদিদ টানা ফুল ২৬ দিন একটানা কাজ করে প্রজেক্ট কমপ্লিট করে । আসলে এর মাঝেই আমরা সব বড় হয়ে গেছি ।

তো কথায় বলে চোখের দূরত্ব বেড়ে গেলে নাকি মনের দূরত্ব বেড়ে যায় । কথাটা ভুল না আসলে । আমার স্কুল, কলেজ লাইফের সার্কুলই যথেষ্ট প্রমাণ আমার জন্য । এক্ষেত্রে অবশ্য দোষ দেয়ার নেই কাওকে । সবাই ব্যস্ত । আমি নিজেও । আমরা চার বছর একটা ভাল সময় কাটিয়েছি । ভাল সময় বলতে অবশ্যই আমি আমার চারপাশের মানুষগুলোর ব্যাপারে বলছি । আমি আমার পুরো লেখায় শুধু নিজের ব্যাচের মানুষগুলোর ব্যাপারেই বলে গেছি । কিন্তু আমার জুনিয়র আর সিনিয়র মানুষগুলো ও কী পরিমানে জোস একেকজন, এটা না বললে গুনাহ হবে । আজ আমি যেখানে আছি, যেসকলমই আছি এটার ইফেক্ট অবশ্যই এই মানুষগুলো । এই মানুষগুলোর জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আর দোয়া ।

আর শেষ কথা, কয়েকদিন পরে হয়তোবা এদের সাথে এখনকার মতো প্রতিদিন দেখা হবে না । মাঠে ঘাটে হঠাত হঠাত দেখা হবে আর চোখ কচলিয়ে চিন্তা করা লাগবে এটা ও না ? বয়স বাড়লে এটা আরো পরকট হবে । কিন্তু একটা জিনিস সবসময় থাকবে ।

আমরা একুশ ছিলাম । একুশ থাকব । আর এই ৪-২ ভাগটা অসম্পূর্ণ থাকুক । সেটা ভাল

শেষ কথা:

যাই হোক, এই লেখা পুরোপুরি আমার পার্সপেকটিভ থেকে লেখা । সোজা কথায় বলতে গেলে, *আমার ছেলেবেলা* টাইপের । আমি আসলে প্রচণ্ড রকম ইমোশনাল টাইপের একজন মানুষ । সেই ১-১ থেকে এই ৪-২, পুরো জার্নিটা আমার নিজের কাছে কেমন জানি একটা ইমোশনাল রোলার কোস্টার এর মতো মনে হয় । লেখার পরে আমার নিজের ই মনে হয়েছে, মাত্র তো চারটা বছর, এর মাঝেই এতো চেঞ্জ হয়ে গেলাম !!!!

১৮/১০/২০১৮

রাত ২.৩২